বিষ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য



বয়স নেহাত কম নয় মহিলার। অন্তত বছর পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। মুখেও ভাঙচুর এসেছে টুকটাক। তবু সাজগোজের কী বহর! চোখে গাঢ় আই লাইনার, ঠোঁটে চড়া লিপস্টিক, গালে থুতনিতে ব্লাশ অনের উৎকট ছোপ। কাঁধ ছোঁওয়া স্টেপ কাট চুলে সরু সরু সোনালি টান। দামি শিফন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজটিও বিপজ্জনক রকমের সংক্ষিপ্ত। বোঝাই যায় খুকি সাজার চেষ্টায় মহিলার কোনও খামতি নেই।

মিতিন এক দৃষ্টে লক্ষ করছিল মহিলাকে। শুধু মেক আপই নয়, মহিলার ভাবভঙ্গিও। একটু যেন কেমন কেমন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়াই হাজির হয়েছে ভর সন্ধেবেলা। বলল কী যেন জরুরি দরকার, অথচ টানা পাঁচ মিনিট বসে আছে সোফায়, মুখে বাক্যিটি নেই। ঘাড় ঝুলিয়ে রং করা বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটছে এক মনে।

নার্ভাস বোধ করছে কী? নাকি সংকোচ? পোশাকের জেল্লাই বলে দিচ্ছে, মহিলা যথেষ্ট পয়সাওয়ালা ঘরের। এই ধরনের মহিলারা যে যে কারণে পেশাদার গোয়েন্দাদের দ্বারস্থ হয়, তা মোটামুটি জানে মিতিন। হয় বর বুড়ো বয়সে কারও সঙ্গে লটঘট চালাচ্ছে, তার পিছনে ফেউ লাগাতে চায়। নয়তো নিজেই কোনও কেচ্ছা বাধিয়ে ফেঁসে গেছে, ব্ল্যাকমেলারের পাল্লায় পড়ে হাঁসফাঁস দশা, উদ্ধার পেতে শরণাপন্ন হয়েছে মিতিনদের। এর কেসটা কী? এক নম্বর? না দু'নম্বর?

মিতিন অবশ্য খোঁচাখুঁচিতে গেল না। মহিলার আড় ভাঙানোর জন্য নরম গলায় বলল, চা চলবে নাকি একটু?

মহিলা মুখ তুলেছে। চোখ পিটপিট করে বলল, যদি হয়... লিকার টি।
— উইথ সুগার?
— হ্যাঁ। এক চামচ।

উঠে আরতিকে নির্দেশ দিয়ে সোফায় ফিরল মিতিন। বসতে বসতে বলল, আপনার নামটা কিন্তু এখনও জানা হয়নি ম্যাডাম।
— বলিনি, না? মহিলা ফ্যালফ্যাল তাকাল, আমি লাবণ্য। লাবণ্য মজুমদার।

মহিলার দৃষ্টি যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়। কেমন ঘোলাটে ঘোলাটে। উদ্‌ভ্রান্ত। মিতিন ফের জিজ্ঞেস করল, কাছাকাছি কোথাও থাকেন কি?
— খুব দূরে নয়। গড়িয়াহাটে।
— গড়িয়াহাটের কোথায়?
— এমারেল্ড টাওয়ার। গরচায় ঢুকেই যে দশ তলা বিল্ডিংটা...
— যে বাড়িতে বিখ্যাত গায়ক অরুণ চক্রবর্তী থাকেন?
— হ্যাঁ হ্যাঁ। উনি ফিফ্‌থ ফ্লোরে। আমরা আট তলায়।
— আমরা মানে?
— আমি, আর আমার হাজব্যান্ড।
— আপনাদের ছেলেমেয়ে?
— একটি। মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। এমারেল্ড টাওয়ারের সেকেন্ড ফ্লোরে আমাদের আর একটা ফ্ল্যাট আছে। মেয়ে-জামাই সেখানেই থাকে।
— বেশ। মিতিন সোফায় হেলান দিল, এ বার বলুন আপনার সমস্যাটা কী?



কথায় কথায় বেশ খানিকটা সহজ হয়েছিল লাবণ্য, আবার চুপ মেরে গেছে। তাকাচ্ছে এ-দিক ও-দিক। হঠাৎই চোখের মণি স্থির করে বলল, আমার খুব বিপদ।
মিতিন মনে মনে বলল, সে আর বলতে! মুখে বলল, কী হয়েছে?
— মাই লাইফ ইজ ইন ডেঞ্জার। আপনি আমাকে বাঁচান, প্লিজ। সামওয়ান ইজ ট্রায়িং টু কিল মি।
— মেরে ফেলতে চাইছে? মিতিনের চোখ সরু, কেন?
— জানি না। তবে আমাকে স্লো-পয়জনিং করা হচ্ছে। আমি টের পাচ্ছি।
— কী ভাবে?
— আমার স্কিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখুন, দেখুন...। লাবণ্য উত্তেজিত মুখে হাত দুটো বাড়িয়ে দিল, কী রকম র‍্যাশ বেরিয়েছে দেখুন। আরও অনেক জায়গায় আছে। পায়ে, পেটে, বুকে...। বাদামি বাদামি ছোপও পড়ছে। ঘাড়ে, গলায়, কপালে... অথচ তিন চার মাস আগেও আমার স্কিন কত সুন্দর ছিল। হঠাৎ কেন এ সব হচ্ছে, বলুন?

ঝুঁকে ভাল ভাবে নিরীক্ষণ করল মিতিন। লাবণ্যর হাতে শুকনো ঘামের মতো গুঁড়ি গুঁড়ি দানা ফুটেছে বটে, কিন্তু প্রসাধিত মুখমণ্ডলে ছাপছুপ খুঁজে পাওয়া দায়। মহিলা ম্যানিয়ায় ভুগছে না তো? অতি মাত্রায় রূপ সচেতন মধ্যবয়সী মহিলারা চামড়া টামড়ার ব্যাপারে বড্ড বেশি স্পর্শকাতর থাকে। তিলকে তাল করে ফেলে অনায়াসে। হাল্কা গলায় মিতিন বলল, শুধু এই সব দেখেই আপনি ধরে নিলেন আপনাকে স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে?
— আরও সিম্পটম আছে। কিছু খেতে ইচ্ছে করে না। কেমন একটা বমি বমি ভাব। ওয়েট লুজ করছি। চোখ দুটো হঠাৎ হঠাৎ খুব চুলকোয়। মাঝে মাঝেই জল কাটে।
— তা এ সব তো অনেক কারণেই হতে পারে ম্যাডাম। হঠাৎ বিষের চিন্তাটা আপনার মাথায় এল কেন?
— কারণ, আমি জানি। কিছু দিন আগে একটা বইতে পড়েছি। ওখানে আর্সেনিক পয়জনিংয়ের

যা যা উপসর্গ লেখা আছে, সব কটাই আমার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।
ও, এই ব্যাপার? পুঁথি পড়ে ভয়? মিতিনের ঠোঁটের কোণে চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

অমনি লাবণ্যর নজরে পড়েছে হাসিটা। থরথর উত্তেজনা নিবে গেল দুপ করে। মুখ ফ্যাকাশে সহসা। স্তিমিত স্বরে বলল, বুঝেছি। আপনি বিশ্বাস করছেন না। কেউই করে না। এ যে আমি কী জ্বালায় পড়েছি...! আরতি চা এনেছে। ট্রে থেকে কাপ ডিশ তুলে লাবণ্যকে বাড়িয়ে দিল মিতিন। হাতে নিল লাবণ্য, তবে ডিশের ওপর কাপ কাঁপছে তিরতির। মিতিন মৃদু স্বরে বলল, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন মিসেস মজুমদার? বিষ যে আদৌ আপনাকে দেওয়া হচ্ছে, সে ব্যাপারে আগে ডেফিনিট হন। ডাক্তার দেখিয়েছেন?

— আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান দেখেছেন। তাঁর মতে মুখ-টুখে এ রকম পিগমেন্টেশন নাকি এই বয়সে হয়েই থাকে। র‍্যাশগুলোও নাকি জাস্ট স্কিন ডিজিজ। কোনও কসমেটিক্স থেকে অ্যালার্জি। একটা মলমও দিয়েছিলেন, লাগিয়েছি। কিস্যু কাজ হয়নি। পরশু অয়েন্টমেন্টটা উনি বদলে দিলেন। লাবণ্যর গলা ফের চড়তে শুরু করেছে। সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রাখল চা। রাগ রাগ ভঙ্গিতে বলল, ভাবুন... উনি আমার ভমিটিং টেন্ডেন্সিটাকেও পাত্তা দিতে নারাজ। একটা লিভার টনিক লিখে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ। আর চোখের ব্যাপারটা তো উনি শুনলেনই না। আই স্পেশালিস্ট দেখাতে বললেন।
— অর্থাৎ, ডাক্তারবাবু পয়জনিংয়ের সম্ভাবনাটা মানছেন না। তাই তো?
— হুম।
— কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথায় আপনার আস্থা নেই!
— হুম।
— তা হলে সেকেন্ড কাউকে দেখাচ্ছেন না কেন?
— কার কাছে যাই বলুন তো? কে বিশ্বাস করবে? বাড়ির লোকরাই যেখানে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছে...
— বাড়ির লোক মানে কে? হাজব্যান্ড?
— মেয়ে জামাইও আছে। সবার ধারণা, এটা আমার একটা বাতিক। অথচ আমি তো বুঝছি কী ভাবে আমাকে...



মহিলার গলা ধরে এসেছে। নাহ্, এর মাথা থেকে বিষের ভূত নামানো বেশ কঠিন এখন। দু'এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মিতিন গুছিয়ে বসল। মুখে একটা ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনিই ঠিক। কিন্তু পয়জনিং তো ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে জীবন মৃত্যু জড়িয়ে আছে। অতএব এর একটা কার্যকারণ থাকবেই। প্রথমে প্রশ্ন আসবে, কে বিষ দিচ্ছে? তার পর দেখতে হবে কেন দিচ্ছে। এবং সব শেষে গিয়ে বার করতে হবে, কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে। তাই তো?

লাবণ্য ঢক করে ঘাড় নাড়ল।
— আগে তা হলে বলুন কাকে আপনার সন্দেহ হয়?
লাবণ্য চুপ। ঢোক গিলছে।
— কী হল? বলুন?
— সম্ভবত আ আ আমার...। লাবণ্য ফের ঢোক গিলল, আমার হাজব্যান্ড।

মিতিন খুব একটা চমকাল না। এ রকমই উত্তর সে আশা করেছিল। নিরুত্তাপ স্বরে বলল, কিন্তু কেন তিনি আপনাকে বিষ দেবেন?

— তা আমি জানি না।

— আপনি মারা গেলে ফিনানশিয়াল ব্যাপারে তাঁর কি লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

— নাহ্। তার নিজেরই অনেক টাকা। আমি তো প্লেন হাউস ওয়াইফ।

— আপনার বাপের বাড়ির তরফের কোনও সম্পত্তি...?

— নেই। একখানা আধভাঙা বাড়ি আছে সোদপুরে। ভাই থাকে। ও বাড়ি বেচলেও আমার ভাগে ক'পয়সাই বা আসবে!

— হুম। ...আপনার হাজব্যান্ড কি রিসেন্টলি কোনও মোটা ইনশিওরেন্স করিয়েছেন আপনার নামে ম?

— না।

— তাঁর কি সম্প্রতি অন্য কারওর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক...?

— মনে হয় না। অন্তত আমার জানা নেই।

— অর্থাৎ অ্যাপারেন্টলি তাঁকে সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই, অথচ আপনি তাঁকেই সাসপেক্ট করছেন? কেন?

— ইদানীং আমার প্রতি ওর ব্যবহারটা কেমন বদলে গেছে।

— কী রকম?

— ফ্র্যাংকলি বলব?

— অবশ্যই।

— আমি আর অনিমেষ একেবারে ডিফারেন্ট টাইপের। আমি মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসি। ক্লাব টাবে যাই। বন্ধু টন্ধুদের সঙ্গে হইহল্লা করি। আর অনিমেষ কাজ ছাড়া কিছু বোঝে না। সে আমার লাইফস্টাইল পছন্দ করে না, আমারও তার সারা ক্ষণ কাজ নিয়ে থাকাটা ভাল্লাগে না। বেঙ্গালুরুতে থাকতে তো আমাদের এই নিয়ে রেগুলার ফাটাফাটি হত। ভয়ংকর তেতো হয়ে গিয়েছিল সম্পর্কটা। কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে রুমকির, মানে আমাদের মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর থেকে অনিমেষ যেন আমার প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। ভীষণ সফ্টলি কথা বলে, কখনও চটে না, ঝগড়া তো নেইই প্রায়... এগুলোই কি অস্বাভাবিক নয়? নিশ্চয়ই তলে তলে কোনও মতলব ভেঁজেছে, নইলে হঠাৎ এ রকম আচরণ করবে কেন?



মহিলার গলা ধরে এসেছে। নাহ্, এর মাথা থেকে বিষের ভূত নামানো বেশ কঠিন এখন। দু'এক সেকেন্ড ভেবে নিয়ে মিতিন গুছিয়ে বসল। মুখে একটা ভারিক্কি ভাব ফুটিয়ে বলল, ঠিক আছে, ধরে নিলাম আপনিই ঠিক। কিন্তু পয়জনিং তো ছেলেখেলা নয়। এর সঙ্গে জীবন মৃত্যু জড়িয়ে আছে। অতএব এর একটা কার্যকারণ থাকবেই। প্রথমে প্রশ্ন আসবে, কে বিষ দিচ্ছে? তার পর দেখতে হবে কেন দিচ্ছে। এবং সব শেষে গিয়ে বার করতে হবে, কী ভাবে দেওয়া হচ্ছে। তাই তো?

প্রসঙ্গ ঘোরানোর জন্য মিতিন আলগা কৌতূহল দেখাল, আপনার হাজব্যান্ড কী করেন?

— সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। বছর ছয়েক হল বেঙ্গালুরুর চাকরি ছেড়ে কলকাতায় এসে ব্যবসা করছে। ওই লাইনেই। সল্টলেকে অফিস খুলেছে।

— কেমন চলছে বিজনেস?

— ভালই তো। মাত্র চার বছরের মধ্যে সেকেন্ড ফ্ল্যাটটা কিনে ফেলল। তিন তলার ছোট

অ্যাপার্টমেন্টটা ছেড়ে আমরা আট তলায় উঠে এলাম...
— নীচেরটা বুঝি মেয়ে জামাইকে যৌতুক দিলেন?
— ঠিক তা নয়। ফাঁকা পড়ে ছিল ফ্ল্যাটটা... ওরা থাকছে...
— জামাইয়ের নিজস্ব বাড়িঘর...?
— ওদের জয়েন্ট ফ্যামিলি। পাইকপাড়ায়। ভাবলাম রুমকির হয়তো ওখানে মানিয়ে নিতে অসুবিধে হবে... রুমকির স্কুলটাও এখান থেকে কাছে হয়...
— মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে আপনার রিলেশন কেমন?
— নর্মাল। রুমকি তো সময় পেলেই ওপরে চলে আসে।
— জামাই কী করে?
— তার কারবার শেয়ার টেয়ার নিয়ে।
— ও। মিতিন দেওয়ালঘড়িতে ঝলক তাকিয়ে নিয়ে মূল প্রশ্নে এল, এ বার বলুন, আমি কী ভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?
— কাইন্ডলি এক বার আমার ফ্ল্যাটে আসুন। লাবণ্যর স্বর ফের কাতর, মিট অনিমেষ।
— তাতে কী লাভ?
— একটু যাচাই করে দেখবেন। আর আপনার মতো নামী ডিটেকটিভকে দেখলে অনিমেষও নিশ্চয়ই সমঝে যাবে। হোপফুলি, আমি বিপদ থেকে মুক্তি পাব।

নেহাতই ছেলেমানুষি চিন্তা। মিতিন হাসবে, না কাঁদবে? তবু পেশার খাতিরে গাম্ভীর্যের মুখোশটা তো রাখতেই হয়। ঠোঁট টিপে মিতিন বলল, সে দেখা যাবে'খন। তার আগে আপনি বরং একটা কাজ করুন। কোনও একটা প্যাথলজিকাল ল্যাবে গিয়ে রক্তটা পরীক্ষা করান। আই মিন, ব্লাডে আর্সেনিকের মাত্রাটা। রিপোর্ট যদি অ্যালার্মিং হয়, তখন তো আমি আছিই।



লাবণ্যর চোখ চকচক করে উঠল, দারুণ একটা অ্যাডভাইস দিয়েছেন তো। গুড গুড।
— হ্যাঁ, এতে আপনার সংশয়েরও নিরসন হবে।
— দেখেছেন তো এত সহজ ব্যাপারটা আমার মাথায় আসেনি। ভাগ্যিস আপনার কাছে এসেছিলাম। লাবণ্য উল্লসিত মুখে সুদৃশ্য ভ্যানিটিব্যাগের চেন খুলছে। একটা খাম এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা রাখুন।

মিতিন ভুরু কুঁচকোল, কী আছে এতে?
— আপনার কনসাল্টেশন ফি।
— সে কী? আমি তো কেস এখনও হাতে নিইনি!
— সো হোয়াট? আপনার মূল্যবান সময় তো নষ্ট করেছেন।
— তবু...
— কোনও তবু নেই। এটা আপনাকে নিতেই হবে। প্রায় জোর করে মিতিনের হাতে খামটা গুঁজে দিল লাবণ্য। উঠে দাঁড়িয়েছে, আমি কিন্তু আপনার কাছে আবার শনিবার আসছি। এই স ময়ে।

শনিবার বুমবুমকে নিয়ে হ্যারি পটার দেখতে যেতে হবে। ছেলেকে কথা দিয়েছে মিতিন। ক্যানসেল করলে বুমবুম তুমুল হল্লা জুড়বে। একটু ভেবে নিয়ে মিতিন বলল, আপনি যদি রে ববার... সকালের দিকে...

— না, না। অনিমেষ এখন ট্যুরে, শনিবার রাতে ফিরবে। তার আগেই আমি আপনার কাছে আসতে চাই। প্লিজ... শনিবার ইভনিংটা আপনি আমার জন্য ফ্রি রাখুন।

লাবণ্যর অনুনয়ে দোটানায় পড়ল মিতিন। আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, আসুন। তার আগে কিন্তু অবশ্যই ব্লাড টেস্টটা... লাবণ্য চলে যাওয়ার পর মিতিন খুলল খামটা। ন'খানা পাঁচশো টাকার নোট, পাঁচটা একশো। কড়কড়ে নতুন। সম্ভবত আসার পথেই এ টি এম থেকে তোলা। বেচারা বরটার কী কপাল! তারই অর্থ ধ্বংস করে তার পিছনে কাঠি দেওয়ার তোড়জোড় চালাচ্ছে ম্যানিয়াক বউ! রাতে খেতে বসে পার্থকে লাবণ্যর গল্প শোনাচ্ছিল মিতিন। পার্থ তো বেজায় মজা পেয়েছে। ঝটিতি ঘোষণা করে দিল, শনিবার প্রেস টেস বন্ধ করে চারটের মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাবে। ছিটিয়াল, পতিবিদ্বেষী মহিলাটিকে দর্শনের সুযোগ সে ছাড়বেই না। কিন্তু শনিবারের আগেই জোর চমক। শুক্রবার রাতে টেলিভিশনের বাংলা নিউজ চ্যানেলগুলোয় ভেসে উঠল এক দুঃসংবাদ। মধ্যবয়সী মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যু! গড়িয়াহাটের এমারেল্ড টাওয়ারের আট তলায়! মিতিন স্তম্ভিত। এমন ধাক্কা সে আগে কখনও খায়নি।

বিষ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সকাল দশটা নাগাদ থানায় এল মিতিন। অফিসার ইন চার্জ সুবীর হালদারকে ফোন করাই ছিল, মিতিনকে দেখেই তার পুলিশি গলা গমগম, আসুন, আসুন ম্যাডাম। আপনার জন্যই ধূপধুনো জ্বালিয়ে বসে আছি।

— আমার সৌভাগ্য। মিতিন চেয়ার টেনে বসল, লাবণ্যদেবীর বডি কি পোস্টমর্টেমে চলে গেছে?

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। এত ক্ষণে বোধহয় পুলিশ মর্গ থেকে বেরিয়ে কাঁটাপুকুরের টেবিলে।

— পি এম রিপোর্ট কবে পাচ্ছেন?

— মঙ্গলবার, কিংবা বুধ। বড়সড় টেবিলের ওপারে ঘুরনচেয়ারে উপবিষ্ট দশাসই চেহারার সুবীর ঝুঁকল সামান্য। মোটা মোটা ভুরু নাচিয়ে বলল, ব্যাপার কী বলুন তো? কাল রাত্তিরে ফোন... আজ সকালে ফোন... মহিলা কি আপনার চেনা জানা?



— একেবারে অপরিচিত আর বলি কী করে? মিতিন অল্প হাসল, ভদ্রমহিলা এই বুধবারেই তো আমার কাছে এসেছিলেন।

— তাই নাকি?

— হুঁ। বলছিলেন ওঁকে নাকি স্লো পয়জনিং করা হচ্ছে।

— ইন্টারেস্টিং! সুবীর চোখ পিটপিট করল, জানেন তো, আমিও কাল স্পটে গিয়েই গন্ধ পেয়েছি। জরুর ডালমে কুছ কালা হ্যায়।

— কী রকম?

— অ্যাপারেন্টলি সুইসাইড কেস। নিজের বিছানায় হাত পা বেঁকিয়ে পড়ে আছে, মুখে গ্যাঁজলা...। কিন্তু ও দিকে আবার ড্রয়িংরুমের টেবিলে আধ গ্লাসের ওপর হুইস্কি। আত্মহত্যার আগে কেউ অতটা মাল ফেলে রেখে যায়, বলুন? টেনশানেই তো ঢকাস করে গলায় ঢেলে দেবে। প্লাস, কিচেনের সিংকে আর একটি গ্লাস নামানো। ফাঁকা, তবে আমি ডেফিনিট ওতেও ড্রিংকস ছিল। হাইলি ফিশি।

— অর্থাৎ আপনি বলছেন, ভদ্রমহিলার সঙ্গে আর এক জন কেউ ড্রিংক করছিলেন?

— অথবা করেছিলেন।

— কিন্তু গ্লাসটা সিংকে ফেলে যাবে কেন? ধুয়ে মুছে জায়গা মতন রেখে দেওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল। অফকোর্স যদি সেই মার্ডারার হয়। মিতিন আপন মনেই যেন বিড়বিড় করল কথাগুলো। কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে নামিয়ে বলল, বাই দা বাই, আপনারা নিউজটা পেলেন কখন?

— অ্যারাউন্ড সাড়ে সাতটা। মহিলার হাজব্যান্ড থানায় ফোন করেছিল।



পলকের জন্য মিতিনের ভুরুতে ভাঁজ। পরক্ষণে স্বাভাবিক স্বরে বলল, উনিই কি প্রথ ম ডেডবডিটা দেখেন?

— না। ওদের কাজের মেয়ে। কোথায় যেন চরতে বেরিয়েছিল, ফিরে দেখে ওই কাণ্ড। তার পর মেয়েটাই হল্লা জুড়ে ফ্যামিলির লোকজনকে ডাকে।

— মৃত্যুর টাইমটা জানা গেছে?

— পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে।

— হুম। মিতিন একটু ক্ষণ চুপ থেকে বলল, খুব খারাপ লাগছে, জানেন। ভদ্রমহিলা আমার হেল্প চাইলেন, অথচ ভাল করে কিছু বোঝার আগেই উনি...

— তাই বুঝি মর্মপীড়ায় ভুগছেন?

— একদম ঠিক। এখন আপনাদের পাশে পাশে আমিও একটা ইনভেস্টিগেশান চালাতে পারলে মানসিক শান্তি পাই। অফকোর্স আপনাদের কো অপারেশানও দরকার।

— দেখুন ঘাঁটাঘাঁটি করে। সুবীর মুচকি হাসল, তবে আপনাদের লাবণ্য মজুমদার সম্পর্কে রি পোর্ট কিন্তু খুব খারাপ। স্বভাবচরিত্র নাকি মোটেই সুবিধের ছিল না মহিলার। যদ্দুর খবর পেয়েছি, অত্যন্ত ফাস্ট লাইফ লিড করত। রেগুলার ক্লাব, পার্টি, হাঁসের মতো মাল টানা, র াতদুপুরে বেহেড হয়ে ফেরা, আটচল্লিশ বছর বয়সেও কচি ছেলে ধরার জন্য ছোঁকছোঁক, গুণের সৌরভে একেবারে ম ম। এই টাইপের মহিলারাই তো বেঘোরে মরে।

— তা বলে কেউ তাকে মেরে ফেলবে, এটাও নিশ্চয়ই মেনে নেওয়া যায় না?

— অফকোর্স নট। হোমিসাইড প্রমাণ হলে আমরাও কোমর বেঁধে লাগব বই কী! হুইস্কি আর গ্লাস দুটো ফরেনসিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। পি এম রিপোর্টটাও হাতে আসুক...

সুবীরের সঙ্গে আরও দু'চারটে কথা বলে উঠে পড়ল মিতিন। সকাল থেকে বেশ মেঘ করেছে আজ। ভাদ্রের শুরুতে আকাশ ক'দিন দারুণ ঝকঝকে ছিল, এখন আবার বৃষ্টি হচ্ছে মাঝে মাঝে। রাস্তায় নেমে মিতিন দেখে নিল ব্যাগে ছাতাটা আছে কি না। হাঁটছে চিন্তিত মুখে।

থানা থেকে ঘটনাস্থলের দূরত্ব বেশি নয়। মিনিট দশেকের মধ্যে মিতিন পৌঁছে গেছে এমারেল্ড টাওয়ারে। খাড়া দশতলা আবাসনটির গেটে নিরাপত্তারক্ষীর বেজায় কড়াকড়ি। বহিরাগতদের না ম ঠিকানা গন্তব্য লিখে ঢুকতে হয়। রীতিপ্রকরণের বেড়াটুকু টপকে মিতিন যখন লাবণ্যদের ফ্ল্যাটে বেল বাজাল, ঘড়ির কাঁটা তখন এগারোটা ছুঁয়েছে।

দরজা খুলেছে এক মাঝবয়সী পুরুষ। সাদামাটা, বিশেষত্বহীন চেহারা। চোখে চশমা, মাথায় উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। মুখে একটা দিশেহারা ভাব। ভদ্রলোক প্রশ্ন করার আগে মিতিনই সপ্রতিভ স্বরে বলে উঠল, নমস্কার। আমার নাম প্রজ্ঞাপারমিতা মুখার্জি। থার্ড আই থেকে আসছি। আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মজুমদার? আই মিন, লাবণ্যদেবীর হাজব্যান্ড?



— আবার মিডিয়া? অনিমেষ হাত জোড় করল, কাল রাত থেকে তো অনেক হল, এ বার একটু ছাড়ান দিন না, প্লিজ।

— ভুল করছেন স্যর। আমি মিডিয়ার লোক নই। মিতিন বিনয়ী সুরে বলল, আমি এক জন পেশাদার গোয়েন্দা।

— ও। তা এখানে কী চাই?

— জাস্ট দু'চারটে প্রশ্ন ছিল। যদি কাইন্ডলি একটু সময় দেন...। মিতিনের গলা আরও নরম, আসলে দিন তিনেক আগে লাবণ্যদেবী আমার কাছে এসেছিলেন তো...

— লাবণ্য আপনার কাছে গেছিল? কেন?

— সেটা নিয়েই তো আলোচনা করতে চাইছিলাম। জানি খুব অসময়ে এসেছি, লাবণ্যদেবীর এখনও ক্রিমেশান হয়নি, তবু...

দু'চার সেকেন্ড থমকে রইল অনিমেষ। একটু বুঝি জরিপও করল মিতিনকে। ভারী গলায় বলল, আসুন।

লিভিংরুমখানা বিশাল। বিদেশি সোফাসেট, পুরু কার্পেট, কোণে রাখা স্ট্যান্ডল্যাম্প, বড়সড় ঝাড়বাতি, নামী আর্টিস্টদের পেন্টিং, মহার্ঘ পর্দা আর তামা ব্রোঞ্জ পিতলের ছোটবড় শো পিস থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে বৈভবের দ্যুতি। তবে ঘরের অঙ্গসজ্জা যেন সম্পদের সঙ্গে মানানসই নয়। একটু বা ছন্নছাড়া। অন্তত তেমনটাই মনে হল মিতিনের। অদূরে প্রকাণ্ড ডাইনিং টেবিল। র ান্নাঘরের একটা অংশও যেন দেখা যায়। বন্ধ কাচের দরজার ওপারে ব্যালকনিও দৃশ্যমান। স্প্লিট এসি মৃদু মৃদু ঠান্ডা ছড়াচ্ছে হলে। কাচের সেন্টার টেবিলে আলগা চোখ বুলিয়ে মিতিন বলল, লাবণ্যদেবী আমাকে মিট করেছিলেন বুধবার। সম্ভবত আপনি তখন কলকাতায় ছিলেন না।

— হ্যাঁ। হায়দরাবাদে গিয়েছিলাম। বিজনেস ট্যুর।

— উনি আজ বিকেলে আবার আমার কাছে যাবেন বলেছিলেন। আর আপনার বোধহয় আজ র াতে ফেরার কথা।

— কাজ মিটে গেল, তাই চলে এলাম। অনিমেষ একটু যেন থতমত। কেন বলুন তো?

— লাবণ্যদেবীর আপনার বিরুদ্ধে কিন্তু একটা অভিযোগ ছিল। মিতিন স্থির চোখে তাকাল, আপনি নাকি ওঁকে...

— বুঝেছি। স্লো পয়জনিং করছিলাম। তাই তো? অনিমেষ তেতো স্বরে বলল, ওর মাথাটা ইদানীং একেবারেই গিয়েছিল।

— আমারও অবশ্য লাবণ্যদেবীকে খুব নরমাল লাগেনি। তবে শনিবার... মানে আজ... আমার কাছে সেকেন্ড ভিজিটের আগেই দুম করে উনি মারা গেলেন... এটা কি একটু মিস্টিরিয়াস লাগে না?

— দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ইঙ্গিতটা আমি বুঝেছি। অনিমেষ সোজা হয়ে বসল। বাঁ হাতের তর্জনী তুলে বলল, শুনুন, আমার স্ত্রী ছিল এক সাইকিক পেশেন্ট। মুঠো মুঠো ডিপ্রেশানের ওষুধ খেত সে। বিশ্বাস না হয়, আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান ডক্টর সেনগুপ্তকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন। আপনারা কেন যে রহস্য খুঁজছেন জানি না। তবে যারা লাবণ্যকে কাছ থেকে দেখেছে, তারা একবাক্যে বলবে, ডিপ্রেশানের ঝোঁকে কিছু একটা খেয়ে আত্মহত্যা করা তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

— অর্থাৎ আপনি সিওর, লাবণ্যদেবী সুইসাইড করেছেন?

— আর কী হতে পারে?
— পুলিশ কিন্তু ফ্ল্যাটে দুটো গ্লাস পেয়েছে। একটায় হুইস্কি ছিল, একটা ফাঁকা।



কথাটায় হঠাৎই থম মেরে গেল অনিমেষ। খানিক পরে নিচু গলায় বলল, দেখুন, আপনার কাছে সে গিয়েছিল বলেই বলছি। আমার স্ত্রী ছিল অ্যালকোহলিক। ইনফ্যাক্ট, মদের নেশাই তার মানসিক রোগের কারণ। ফ্ল্যাটে যখন তখন সে বোতল খুলে বসে যেত। হয়তো কালও...
— কিন্তু সিংকে ফাঁকা গ্লাস গেল কী করে?
— বলতে পারব না। তবে নেশার সময়ে তো তার হুঁশ থাকত না... একটা গ্লাস রেখে এসে আর একটা গ্লাসে হয়তো ড্রিংকস ঢেলেছে। ...কী যে পাগলামি করত, আর কী করত না, তার সব কিছু আপনাকে বলতে পারব না। এই মুহূর্তে বলাটা শোভনও নয়। শুধু একটা কথাই বলতে পারি, শি ওয়াজ নট অ্যাট অল নরমাল।

— স্লো পয়জনিংয়ের আতঙ্কটা তবে সেই অস্বাভাবিকতারই লক্ষণ?
— অবশ্যই। কে তাকে মারতে যাবে বলুন? কেন মারবে? কী হবে মেরে?
— হুম। মিতিন মাথা নাড়ল, ওই আতঙ্কটা কাটানোর জন্য আমি ওঁকে একটা রক্ত পরীক্ষা কর তে বলেছিলাম। আর্সেনিক টেস্ট। বৃহস্পতি শুক্রর মধ্যে রিপোর্ট এসে যাওয়ার কথা। রিপোর্টটা আনা হয়েছিল কি না বলতে পারেন?
— না। আমি তো ব্যাপারটা জানিই না। তবে পুলিশ কাল তন্ন তন্ন করে সব খুঁজছিল। পেলে তো নিয়েই যেত।
— তা অবশ্য ঠিক। ...আর একটা কোয়েশ্চন। লাবণ্যদেবীর মৃত্যুর খবরটা যখন পান, তখন নিশ্চয়ই আপনি অফিসে?
— হ্যাঁ। এগারোটা, সওয়া এগারোটা নাগাদ ফিরলাম হায়দরাবাদ থেকে। তার পর বাড়িতে ঘণ্টা দুয়েক রেস্ট নিয়ে তো বেরিয়ে গেছি।
— তখন লাবণ্যদেবী কী করছিলেন?
— ঘরেই ছিল। আয়নার সামনে বসে কী সব মাখছিল মুখে।
— তার মানে তখনও উনি নরমাল মুডে?
— জানি না। এত জেরা করছেন কেন, অ্যাঁ? অনিমেষ হঠাৎই অস্থির। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখে বলল, আপনি এখন আসুন তো। বাড়িতে ভিড় হয়ে যাওয়ার আগে আমাকে খানিক ক্ষণ একা থাকতে দিন।



— সরি, সরি। মিতিনও উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে যেতে গিয়েও ঘুরে তাকিয়েছে, আপনার মেয়ে জামাই কি বডি আনতে গেছেন?
— আরও অনেকেই আছে সঙ্গে। আমার শ্যালক, প্লাস কয়েক জন বন্ধু, রিলেটিভ...
— আপনাদের কাজের মেয়েটিকে দেখলাম না তো! সে কোথায়?
— মালতী? সম্ভবত নিজের ঘরে।

— তার সঙ্গে একটু কথা বলা যায়?
— ওকেও জ্বালাবেন? অনিমেষের গলায় ঝাঁঝ, আমার সারভেন্টস রুমে বাইরে থেকেও ঢোকা যায়। বেরিয়ে বাঁ সাইডে দরজা আছে, সেখানে নক করুন। অনুগ্রহ করে মাথায় রাখবেন, পুলিশ ওকে যথেষ্ট হ্যারাস করেছে, শি ইজ ইন স্টেট অব শক।

সত্যিই যেন ঘাবড়ে আছে মালতী, মুখে প্রায় কথা ফুটছে না। মিতিন পুলিশের লোক নয় জেনে খানিকটা যেন আশ্বস্ত হল বছর কুড়ির স্বাস্থ্যবতী মেয়েটি। ছোট্ট ঘরের সরু তক্তপোষে বসতে বলল মিতিনকে। প্রায় আসবাবহীন ঘর। বেঁটে একখানা আলমারির মাথায় আয়না, আর সাজগোজের নানান সরঞ্জাম। আলনায় ঝুলছে জামাকাপড়। সস্তার নয়, সালোয়ার কামিজগুলো বেশ দামি।

মিতিন কোমল গলায় বলল, তুমি নার্ভাস হোয়ো না। ভেবেচিন্তে আমায় খালি দুটো চারটে উত্তর দাও। ...কাল তুমি কখন দেখলে উনি মারা গেছেন?
— আমি প্রথমটা বুঝিনি উনি বেঁচে নেই। ঘরে ঢুকে পেছন দরজাটা দিয়ে ও দিকে গেছি... দেখি মামি কেমন ভাবে যেন পড়ে আছে বিছানায়, কষ বেয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি দিদি-জামাইবাবুকে ফোন করলাম। ওরা এসে বলল...
— ওরা দেখেই বুঝে গেল লাবণ্যদেবী মারা গেছেন?
— না, না। দিদি তো প্রথমে মামির হাতটা তুলে নাড়ি দেখল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা কেমন হয়ে গেল দিদির। বলল, সর্বনাশ, বডি তো ঠান্ডা!
— তার পর?

— জামাইবাবু সঙ্গে সঙ্গে ফোন করেছে ডাক্তারবাবুকে। দিদি মামাবাবুকে। দু'জনেই এসে পড়ল দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা টরিক্ষা করে বলল, অনেক ক্ষণ আগেই নাকি মরে গেছে। উনিই তো মামাবাবুকে বলল, পুলিশে খবর দিন, মিত্যুটায় গণ্ডগোল আছে। মামাবাবুর তখন কী করুণ দশা। কত বার ডাক্তারবাবুকে বলল, পুলিশের ঝামেলায় গিয়ে কী লাভ... জানেনই তো মাথার গোলমাল ছিল... এখন পুলিশ এলে চার দিকে তো শুধু কাদা ছিটবে...। তাও ডাক্তারবাবুটা কিছুতেই সাট্টিফিকেট দিল না।

মেয়েটা দিব্যি গুছিয়ে কথা বলছে এখন। আড়ষ্টতা বুঝি কেটেছে। মিতিন চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা মালতী, তোমার কী মনে হয়? তোমার মামির মাথায় কি সত্যিই গোলমাল ছিল?
— কী জানি বাপু পাগল কাকে বলে! মালতী ঠোঁট উল্টোল, তবে হঠাৎ হঠাৎ খেপে যেত খুব। শ্রীরাধিকে তখন মা চণ্ডী। হাত পা ছুঁড়ছে, আছড়ে আছড়ে জিনিসপত্তর ভাঙছে...
শ্রীরাধিকে শব্দটা কানে লাগল মিতিনের। মালতীর বাচনভঙ্গিও। কয়েক পল মালতীকে দেখে নিয়ে বলল, কালও কি উনি কোনও কারণে মাথা গরম করেছিলেন?



— না, না। কাল তো মনমেজাজ ভালই...। অবশ্য দুপুরের পর কী হয়েছে বলতে পারব না।
— কেন?
— দুপুর দুটোর পর তো আমি বেরিয়ে গেছি।
— কোথায়?
— বাড়ি। পঞ্চাননতলায়। শুককুরবার করে দুপুরে যাই। ফিরি সেই সন্ধেয়।

— প্রত্যেক শুক্রবার? সেই যবে থেকে কাজ করছ?
— এ বাড়িতে তো বেশি দিন আসিনি। জোর পাঁচ মাস।
— ও। মিতিনের ভুরু ফের জড়ো হয়েছে, কাল কখন ফিরেছিলে?
— সাড়ে ছটা হবে।
— দুপুরে যখন বেরোলে, মামাবাবু বাড়িতে ছিলেন?
— না। তার আগেই তো খেয়েদেয়ে অফিস চলে গেল। বলতে বলতে মালতী আচমকা মিতিনের হাত চেপে ধরেছে, বিশ্বাস করুন দিদি, মামাবাবুর কিন্তু কোনও দোষ নেই। মানুষটা বড় ভাল। প্রাণে খুব দয়ামায়া।
— তাই বুঝি? মিতিন ঝলক চোখ বোলালো আলনায়। খানিক তির্যক সুরেই বলল, তোমার ড্রেসগুলো ভারী সুন্দর। কে দিয়েছে? তোমার মামাবাবু?
— এগুলো বেশির ভাগই দিদির। রুমকিদিদির। আমাকে দিয়েছে।
— ও, আচ্ছা।
— পুলিশ মামাবাবুকে খুব জেরা করেছে দিদি। আমাকেও। আপনারা একটু দেখবেন।

মিতিনকে খবরের কাগজের লোক বলে ধরে নিয়েছে মালতী। ভুলটা না ভাঙিয়ে মিতিন বেরিয়ে এল। লিফটে নীচে নেমে গেটের সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরেছে। সিটে হেলান দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিল আজই এমারেল্ড টাওয়ারে ছুটে এসে লাভ হল কিনা। কিংবা কতটা হল। নাহ, ঠাহর করা কঠিন। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত সবটাই ধোঁয়া। তত ক্ষণ ধৈর্য ধরতেই হবে।

নিস্তরঙ্গ কাটল তিনটে দিন। বুধবার সন্ধেয় সুবীর হালদারের ফোন, পি এম রিপোর্ট পেয়ে গেছি ম্যাডাম।
— কী বেরোল?
— যা ভেবেছি তাই। বিষেই মৃত্যু। পয়জনিংয়ের এফেক্ট ব্রেনের ভাইটাল সেন্টারে হেমারেজ, কার্ডিয়াক সেন্টারে রক্তসঞ্চালন বন্ধ, এবং অক্কা।
— ও। মিতিন নিরুত্তেজ, কী বিষ?
— আর্সেনিকই হবে। হুইস্কিতে মেশানো ছিল। হেভি ডোজে।
— কিন্তু... আর্সেনিকে কি ও ভাবে গ্যাঁজলা বেরোয়?
— ও সব নিয়ে আপনি ভাবুন। গ্লাসের গায়ে দু'রকম ফিংগারপ্রিন্ট মিলে গেছে। একটা লাবণ্যদেবীর। দু'নম্বরটি কার ধরতে পারলেই কাম ফতে। কাল সকালেই বাড়ির মেম্বারদের হাতের ছাপ নিয়ে নেব। সুবীর গমগম হাসল, কে জানে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কী কেউটে বেরোয়।

মিতিনের ষষ্ঠেন্দ্রিয় বলছিল, কেসটাকে বোধহয় বেশি সরলীকৃত করে ফেলছে সুবীর। তবে তর্কাতর্কিতে গেল না মিতিন। অনুরোধের সুরে বলল, একটা কথা বলি? ভিসেরা রিপোর্টটার জন্য ওয়েট করলে হত না? বিষের নেচারটা তা হলে অ্যাকিউরেটলি জানা যেত।
— অসম্ভব। আমি একটা দিনও নষ্ট করতে রাজি নই। এমনিই তো মিডিয়া সারাক্ষণ পুলিশকে ডলছে... আমরা নাকি গদাইলস্করি চালে হাঁটি... কোনও কম্মের নই...
— ঠিক আছে, ঠিক আছে। যান ও বাড়ি। তবে কাল সন্ধেয়।
— কেন বলুন তো?
— ভাবছিলাম ফ্যামিলির লোকগুলোকে আর এক বার বাজিয়ে দেখি। মিতিনের স্বরে মধু ঝরল, আপনারই কাজের সুবিধে হবে। আগেও তো দেখেছেন, পুলিশি কেসে ইনভলভড হলেও আমি কোনও ক্রেডিট দাবি করি না। সুতরাং সুনাম হলে তাও তো আপনাদেরই।
— বেশ। দিলাম একটা বেলা। করুন পণ্ডশ্রম।
টেলিফোন রেখে মিতিন গুম হয়ে বসে রইল কিছু ক্ষণ। ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যের জোরে খানিকটা সময় সে পেল বটে, কিন্তু এগোবে কোন পথে?

বিষ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য



আবার এমারেল্ড টাওয়ার। এ বার আট তলা নয়, তিন তলায়। ভাদ্রের ভ্যাপসা দুপুর তখন সব গড়িয়ে গড়িয়ে বিকেলে পৌঁছেছে। ঘড়ির কাঁটায় পাক্কা একশো কুড়ি ডিগ্রি। বেশ কয়েক বার ফ্ল্যাটের বেল বাজাতে হল মিতিনকে। অবশেষে খুলেছে দুয়ার। এবং সামনে এক রূপবান তরুণ। বয়স তিরিশের আশেপাশে, টকটকে রং, খাড়া নাক, গাঢ় নীল চোখ, পেটা স্বাস্থ্য, উচ্চতা প্রায় ছ'ফুট। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, যেন জীবন্ত গ্রিক ভাস্কর্য। পরনে লাল শর্টস, হাতাবিহীন হলুদ টি শার্ট। বুকে নকশা করে লেখা, আই অ্যাম হাংরি। হাতে ব্রেসলেটও আছে, এক কানে দুল।

এই নব্য যুবাটি তবে রণজয়? লাবণ্য দেবীর জামাতা? দরজার পাল্লায় একটা হাত রেখে দাঁড়িয়েছে রণজয়। মিতিনকে এক টুকরো মেয়ে পটানো হাসি উপহার দিয়ে বলল, ইয়েস প্লিজ? মিতিনের পরিচয় শুনেই অবশ্য নিবে গেছে হাসিটা। চোখ পলকে সরু, ও, আপনিই সে দিন ওপরে গিয়েছিলেন? রুমকির মা আপনার কাছেই...?
— হ্যাঁ। আজ দুপুরে ফোনে রুমকির সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে। রুমকি আমাকে এখানে আসতে বলেছেন।
— কিন্তু রুমকি তো এখনও ফেরেনি।
— আমি বোধহয় একটু আর্লি পৌঁছে গেছি। মিতিনের ঠোঁটে আলগা হাসি, ভেতরে একটু ওয়েট করতে পারি?

সামান্য দোনামোনা করে রণজয় পথ ছেড়ে দিল। মিতিন পায়ে পায়ে ঢুকেছে অন্দরে। আট তলার মতো প্রকাণ্ড না হলেও লিভিংরুমখানা নেহাত ছোট নয়। সাজসজ্জা বাহুল্যবিহীন। ছিমছাম। তবে সোফায়, আর পর্দার রঙে, টিভি ক্যাবিনেটে সাজানো সুন্দর সুন্দর শো পিস, ল্যাম্পশেডে, রুচির ছাপ স্পষ্ট।

রণজয় খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে। জুলজুল চোখে দেখছিল সোফায় বসা আগন্তুককে। মিতিন

হেসে বলল, আমি বুঝি আপনাকে ডিসটার্ব করলাম? রুমকি বলছিলেন আপনার নাকি বাড়িতেই অফিস?



মুখভঙ্গি করে রণজয় বলল, তা হলে নিশ্চয়ই এটাও বলেছে, আমার কাজটা কী?

— অন লাইন শেয়ার ট্রেডিং?

— ইয়েস। ঠিক চারটেয় মার্কেট ক্লোজ হয়। এই সময়টায় আমি সত্যিই ব্যস্ত থাকি।

— তা চারটে তো বেজে গেছে, এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই তেমন কাজ নেই?

— উঁহু, আছে। সারা দিনে স্টক ওঠা পড়ার হালচালটা এই সময়েই স্টাডি করি। ডেলি প্রফিট লসের হিসেবটা কষতে হয়।

— সে এক দিন না হয় পরেই করলেন। বসুন না, একটু গল্প করি।

— বুঝেছি। রণজয়ের ঠোঁটে ধূর্ত হাসি, আমায় ক্রস করতে চাইছেন।

— বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনাও বলতে পারেন। মিতিন রণজয়ের চোখে চোখ রাখল, একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আপনাকে দিতে পারি।

— কী?

— লাবণ্য দেবীকে বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

— খাইয়ে? রণজয় ধপ করে বসে পড়ল, কী করে জানলেন?

— পুলিশ রিপোর্ট। হুইস্কিতে আর্সেনিক ছিল।

— ইজ ইট? রণজয়ের মুখ ফ্যাকাসে, স্ট্রেঞ্জ, ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

— স্ট্রেঞ্জ বলছেন কেন?

— কে মেশাবে বিষ? কখন মেশাবে?

— কেন, দুপুর দুটোর পর থেকে তো উনি একাই ছিলেন। যে কেউ গিয়ে ওই কাজটি করতে পারে। মিতিন মুখ টিপে হাসল, পুলিশ তো কাউকেই ছেড়ে কথা বলে না, সন্দেহের তির আপনার দিকেও আসতে পারে।

— কি-কি-কিন্তু আমি তো সারা ক্ষণ এই ফ্ল্যাটেই ছিলাম।

— প্রমাণ করতে পারবেন তো?

— অফ কোর্স। রুমকি সাক্ষী। রণজয় যেন ঈষৎ উত্তেজিত, রুমকি আমায় চারটেয় ফোন করে ছিল। দশ মিনিট পর তার সঙ্গে আবার আমার কথা হল...

— মোবাইলে? না ল্যান্ডলাইনে?

— প্রথম বার মোবাইল। নেক্সট টাইম ল্যান্ডলাইনে। ওর কাছে একটা লোক আসার কথা ছিল। ইনসিয়োরেন্সের এজেন্ট। আমাকে বসাতে বলেছিল। সে বোধহয় এল সাড়ে চারটের আগে। তার সঙ্গে বসে কথা বলছি, রুমকি ফিরল স্কুল থেকে।

— আর দুটো থেকে চারটে?

— আশ্চর্য, আমি তো জানি না উনি সে দিন মারা যাবেন! তা হলে নয় পাঁচটা বন্ধুকে ডেকে সারা দিন বাড়িতে বসিয়ে রাখতাম। রণজয়ের সুন্দর মুখখানা কেমন বিকৃত দেখাল। দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল, তা ছাড়া উনি তো মারা গেছেন পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটায়। তখন তো আমি, রুমকি, ইনসিওরেন্সের লোকটা, সবাই এ ঘরে।



— বটেই তো। বটেই তো। মিতিনের স্বর শান্ত, আসলে আপনি কাছাকাছি থাকেন বলেই প্রশ্নটা মাথায় এল।
— কাছাকাছি মানে? রণজয় দপ করে জ্বলে উঠেছে, হোয়াট ডু ইউ মিন?
— আহা, এক্সাইটেড হচ্ছেন কেন? আপনারা সেম প্রেমিসেসের বাসিন্দা, নিশ্চয়ই ওপরতলায় আপনার যাতায়াতও আছে...
— তো? দুপুরে কাজকর্ম ফেলে আমি তার ঘরে বসে ড্রিংক করব?
— আমি তো বলিনি আপনি ড্রিংক করছিলেন। জাস্ট একটা সম্ভাবনা...
— কীসের সম্ভাবনা? আমি গ্লাসে বিষ মিশিয়েছি? কেন, লাবণ্য মজুমদার মারা গেলে আমার কী লাভ?
— সরি। আমি কিন্তু আপনাকে হার্ট করতে চাইনি।

রণজয় তবু গজগজ করছে, কাছাকাছি তো অনেকেই থাকে। রুমকির বাবা, মালতীদেরই বা বাদ দিচ্ছেন কেন? লাবণ্য মজুমদার তো স্লো পয়জনিংয়ের ব্যাপারে হাজব্যান্ডকেই সন্দেহ কর তেন।

— ডোন্ট ওরি, আমাদের সবই স্মরণে আছে। তবে পুলিশ ডিটেকটিভদের কাছে সকলেই সাসপেক্ট। আমাদের নজরটাই বাঁকা কিনা। মিতিন ফের হাসল, যাকগে ও সব কথা। এ বার সত্যি সত্যিই গল্প করি। আপনি এক্সাইটমেন্ট খুব ভালবাসেন, তাই না?
— এমন অনুমানের কারণ?
— আপনার শেয়ার মার্কেটে ইন্টারেস্ট দেখে মনে হল।
— ভুলে যাচ্ছেন, এটাই আমার রুটিরুজি।
— হয় ভাল রোজগারপাতি? শুনেছি এতে ভীষণ রিস্ক? দু টাকা এলে দশ টাকা বেরিয়ে যায়?
— টাকা তো আসা যাওয়ার জন্যই। হু কেয়ারস।



কথার মাঝেই রুমকি এসে পড়েছে। লাবণ্যর সঙ্গে মিল নেই মেয়ের, চেহারাটা বরং বাবা ঘেঁষা। টেনেটুনে সুশ্রী বলা যায়। বছর পঁচিশেকের ছোটখাট্টো রুমকির পোশাক আশাক, হাবভাব, সবই লাবণ্যর বিপরীত। চোখেমুখে বিষণ্ণতার আভাস। সদ্য মা হারিয়েছে বলে কি? না কি রুমকি এ রকমই?

একটু যেন নিস্তেজ গলাতেই রুমকি জিজ্ঞেস করল, অনেক ক্ষণ এসেছেন?
— এই তো মিনিট কুড়ি পঁচিশ। মিতিন ভদ্রতা করে হাসল, আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে গল্পগুজব করছিলাম।
— চা খাবেন?
— নো, থ্যাংকস। লালবাজারে ডিসি ডিডির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, এখানকার কাজ সেরে চটপট বেরোতে হবে।
— ও। রুমকি কাঁধের ঝোলা ব্যাগ টেবিলে রেখেছে। তাপহীন স্বরে রণজয়কে বলল, যদি চাও... এ বার তোমার কাজে যেতে পারো।
— হুঁ। যাই।

খানিকটা যেন অন্যমনস্ক মুখে উঠে গেল রণজয়। তেরচা চোখে তার যাওয়াটা দেখে নিয়ে মিতিন বলল, আপনার হাজব্যান্ড মানুষটা কিন্তু বেশ। ঝাপসা ভাবে হাসল রুমকি। অস্ফুটে বলল, থ্যাংকস।

— আপনাদের কি লাভ ম্যারেজ?
— পুরোপুরি নয়। রুমকি সামান্য থেমে থেকে বলল, একটা লেডিজ ক্লাবের ফাংশনে মা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তার পর রণজয়ের বাড়িতে আসা যাওয়া শুরু হল... নিজেই এক দিন বিয়ের কথা তুলল...
— আপনিও নিশ্চয়ই এক কথায় রাজি?
রুমকির ঠোঁটে আবার একটা আবছা হাসি, মাও খুব চেয়েছিল আমাদের বিয়েটা হোক।
— বাহ্, বেশ। মিতিন সোজা হল, তা আপনার মার পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম তো সব মিটে গেছে। তাই না?
— হ্যাঁ। অপঘাতে মৃত্যু... তিন দিনে কাজ...
— অপঘাতের নেচারটা তো তখন ফোনে বললামই। পুলিশের সন্দেহটাও।
— আমি কিন্তু এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। রুমকির গলায় যেন কান্না, কে এই কাজ করল বলুন তো? কেন করল?
— সে প্রশ্ন তো আমাদেরও। ...আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?
— কাকে সন্দেহ করব?
— কোনও আত্মীয়স্বজন? বন্ধুবান্ধব?
— আত্মীয়দের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগাযোগ নেই। একমাত্র মামাই যা আসে কালেভদ্রে। মার বন্ধুরাও তো বাড়িতে আসত না বিশেষ। তাদের সঙ্গে মার দেখাসাক্ষাৎ তো সব বাইরে বাইরে। কখনও যদি মা বাড়িতে পার্টি টার্টি দিল তো...
— ওই দিন তো সে রকম কিছু ছিল না! অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় তাদের কেউ আসেনি?
— বটেই তো। এলে তো মালতীর কাছে শুনতাম।
— কিন্তু মালতী তো দুটোয় চলে গেছে। তার পর যদি কেউ...
— সেটা হতে পারে। ...দুটো হুইস্কির গ্লাসও তো পাওয়া গেছে।



— এই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? যার সঙ্গে বসে আপনার মা ড্রিংক করছিলেন?

— সরি। বলতে পারব না।
— আপনি নিশ্চয়ই জানতেন লাবণ্যদেবী স্লো পয়জনিংয়ের আতঙ্কে ভুগছিলেন?
— জানি। ওটা মার এক ধরনের মেন্টাল ফিক্সেশান ছিল।
— তিনি কিন্তু বিশেষ এক জনকে সন্দেহও করতেন।
— বাবাকে তো? রুমকি হঠাৎই অসহিষ্ণু ভাবে মাথা ঝাঁকাল, অসম্ভব। একেবারেই ভিত্তিহীন ধারণা।
— লাবণ্যদেবী কিন্তু আমায় বলেছিলেন হাজব্যান্ডের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মোটেই ভাল ছিল না।
— মা কী বলেছে জানি না, তবে... বাবা মাকে ভীষণ ভালবাসত। নইলে আঠাশ বছর মার সঙ্গে ঘর করতে পারত না। জোরের সঙ্গে বলতে পারি, মার মৃত্যুকামনা করা বাবার পক্ষে অসম্ভব।

— হুম। মিতিন নড়ে বসল, আচ্ছা, ঘটনার দিন কি লাবণ্য দেবীর সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল?
— প্রায় রোজই স্কুল বেরোনোর আগে এক বার ওপরে ঘুরে যাই। সে-দিনও গিয়েছিলাম।
— তখনও তো অনিমেষবাবু ফেরেননি, তাই না?
— বাবা বোধহয় এগারোটা নাগাদ এসেছিল। দুপুরে মাকে ফোন করেছিলাম, তখনই শুনি।
— দুপুরে? ক'টায়?
— স্কুলের টিফিনটাইমে। ধরুন পৌনে দুটো।
— রোজই বুঝি দুপুরে ফোন করতেন?
— না। মাঝে মাঝে। তবে শুক্রবারটা করতামই। মালতী দুপুরে চলে যায় তো, তাই...
— সে দিন মালতী তখনও ছিল?
— হ্যাঁ। মা বলল, এ বার বেরোবে।
— ও। ...তা বিকেলে তো আর মার কাছে যাননি? একেবারে সন্ধেবেলায়...
— মালতীর ডাক পেয়ে। গিয়ে মার হাতটা ধরতেই ঝটকা খেয়ে গেলাম। দেখি একদম ঠান্ডা হয়ে গেছে।
— এবং তক্ষুনি আপনারা ফোন টোন শুরু করলেন?
— হ্যাঁ। আমার ফোন পেয়েই বাবা এসে গেল। তার পরে পরেই ডাক্তারবাবু।
— অনিমেষবাবু নিশ্চয়ই খুব ভেঙে পড়েছিলেন?
— এ কি আর বলার অপেক্ষা রাখে! এলই তো প্রায় উদভ্রান্তের মতো। ছুটতে ছুটতে বোধহয় দশ বারো মিনিটের মধ্যেই।
— তাই? মিতিনের দৃষ্টি পলকের জন্য তীক্ষ্ণ। পলকে গলা স্বাভাবিক করেছে। সহজ সুরে বলল, ওকে। আপাতত আর কিছু জানার নেই। ...মালতীকে এখন নিশ্চয়ই ওপরে পাব? রুমকি অস্ফুটে বলল, এখন ওপরেও যাবেন?
— যাই এক বার। দু'একটা ছোটখাটো ব্যাপার জানার আছে।
মিতিন উঠে দরজার দিকে এগোল। দুঃখী দুঃখী মুখে রুমকি আসছে পিছন পিছন। হঠাৎই নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে উঠল, ম্যাডাম, খুনি ধরা পড়বে তো?
— চেষ্টা তো করছি।
— আচ্ছা, যে গ্লাস দুটো পুলিশ নিয়ে গেছে, তাতে কারও হাতের ছাপ...? মানে ও-সব দিয়েও তো ধরা যায়।
ঘাড় ঘুরিয়ে মিতিন ঝলক দেখল রুমকিকে। হেসে বলল, হ্যাঁ, তা তো যায়ই। পুলিশ সবই দেখবে। বলেই মিতিন সোজা করিডোরে। তার পর লিফ্ট ধরে সটান আট তলায়।



ফাঁকা ফ্ল্যাটে টিভি দেখছিল মালতী। মিতিনকে দেখে বেশ চমকেছে। অবাক মুখে বলল, দিদি আপনি? আবার?

— তোমার রুমকিদিদির কাছে এসেছিলাম। ভাবলাম তোমার সঙ্গেও একটু দেখা করে যাই।

— বসুন।

— না মালতী, বসার সময় নেই। মিতিন মালতীর কাঁধে হাত রাখল, তোমায় শুধু একটা কথা জানানোর ছিল।

— কী দিদি?

— তোমার মামি কিন্তু আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে।

— অ্যাঁ? মালতী প্রায় আঁতকে উঠেছে, কে মারল?

— এমন এক জন, যে তুমি না থাকার সময়ে এসেছিল। মিতিনের স্বর শীতল, অবশ্য তুমিও যে দুপুরবেলা ফ্ল্যাটে ছিল না, তার কিন্তু কোনও প্রমাণ নেই।

— কী বলছেন দিদি? মালতীর মুখ সাদা হয়ে গেল, বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক দুটোয় বেরি য়েছি।

— সে তোমার পঞ্চাননতলায় খোঁজ নিলেই জানা যাবে।

— আপনি আমার বাড়িতে যাবেন নাকি?

— পুলিশ যাবে। তারা তো সব কিছু ভাল করে বুঝে নেবে।

— তাই? মালতী ঝপ করে মিতিনের হাত চেপে ধরেছে, আমাকে বাঁচান দিদি। ...আ-আ-আমি ম সে দিন বাড়ি যাইনি।

— তার মানে ফ্ল্যাটেই ছিলে?

— নাআআ। আমি সে দিন সিনেমায় গিয়েছিলাম। দিলীপের সঙ্গে।

— কে দিলীপ?

— ইলেকট্রিকের কাজ করে। এ পাড়ায় দোকান আছে।

— হুম। ধরে নিলাম তুমি সত্যি বলছ। মালতীকে আপদমস্তক জরিপ করে নিয়ে মিতিন ফের বলল, কিন্তু পুলিশ তো ছাড়বে না। তোমার কাছেই জানতে চাইবে, দুপুর বিকেলে কেউ ফ্ল্যাটে আসত কি না, সে দিনই বা কে এসে থাকতে পারে, তোমার সঙ্গে তার কোনও যোগসাজশ ছিল কি না...

— মা কালীর দিব্যি, আমি ও সবে নেই। কিচ্ছু জানি না।

— তা বললে চলবে! তুমি রাতদিনের লোক...

— বিশ্বাস করুন দিদি, এমনি দিনে কেউ দুপুরে আসত না। বেশির ভাগ দিন মামিই তো বাইরে বাইরে। তবে শুক্কুরবার...

— থেমে গেলে যে বড়?

— না মানে...। মালতী ঢোঁক গিলল, সে দিন তো আমি থাকি না, বলব কেমন করে কী হত!



পরিষ্কার বোঝা যায়, মালতী কিছু গোপন করার চেষ্টা করছে। কাকে আড়াল দিতে চায়? মিতিন অবশ্য চাপাচাপিতে গেল না আর। ভূতলে নেমে ঢুকেছে সিকিউরিটির কুঠুরিতে। ব্যাগ থেকে পরিচয়পত্র বার করে দিয়ে বলল, একটা জরুরি খবর দরকার।

সবুজ উর্দি নিরাপত্তারক্ষীটি ঈষৎ তটস্থ, বলুন?

— গত শুক্রবার আটশো চার নম্বর ফ্ল্যাটে কে কে এসেছিল? দুপুর দুটো থেকে চারটের মধ্যে?

— কেউ আসেনি। শুধু কাজের মেয়েটা বাইরে গিয়েছিল। তখন বোধহয় দুটো বাজে। তার পর তো সন্ধেবেলা ফিরে দেখে...

— মাঝে মেয়েটা একবারও আসেনি?

— না ম্যাডাম। এলে চোখে পড়ত।

— ওদের বাড়ির আর সবাই? অনিমেষবাবু? তাঁর মেয়ে? জামাই? তারা কে কখন...?

— দিদিমণি তো বিকেলে স্কুল থেকে এলেন। যেমন আসেন। দাদা বেরোয়নি। বলতে বলতে যুবকটির কপালে ভাঁজ, হ্যাঁ, অনিমেষ স্যর চলে গিয়েও এক বার ফিরে এলেন।

— তাই? কখন?

— টাইমটা নিখুঁত মনে নেই ম্যাডাম। এখানকার বাসিন্দাদের ঢোকা বেরোনো তো অত খেয়াল করি না...। তবে অনিমেষ স্যর একটু পরেই আবার বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গাড়ি ছাড়াই। হেঁটে হেঁটে। এত ক্ষণে মিতিনের সামনে যেন আলোর আভাস। হিসেব বোধহয় এ বার মিলবে আস্তে আস্তে।

বিষ

সুচিত্রা ভট্টাচার্য



বুমবুমদের স্কুলে একটা অনুষ্ঠান ছিল আজ। নাচ গান নাটক আবৃত্তি মিলিয়ে রীতিমত জমজমাট ব্যাপার। নাটকে খরগোশ সেজেছিল বুমবুম। সাদা পোশাক পরে, লম্বা লম্বা কান লাগিয়ে সে বেজায় লম্ফঝম্প জুড়ল মঞ্চ জুড়ে। ছেলের কাণ্ডকারখানা দেখে মিতিন তো হেসে বাঁচে না। মা ছেলে বাড়ি ফিরল রাত ন'টায়। ঢুকতে না ঢুকতে পার্থর সরব ঘোষণা— তোমার লাবণ্য কেসের ড্রপসিন তো পড়ে গেল গো?

মিতিন থমকে গেল— মানে?

— ক্যাচ কট কট। পুলিশ আসামী পাকড়াও করে ফেলেছে।

— কে আসামী?

— জামাই বাবাজীবন। রণজয় চৌধুরী। তুমি যাকে অ্যাপোলো বলেছিলে, সেই হারামজাদা। পার্থ চোখ নাচাল, এই তো এত ক্ষণ খবরে দেখাচ্ছিল। হুইস্কির গ্লাসে লাবণ্য ছাড়া যে দ্বিতীয় হাতের ছাপটি পাওয়া গেছে, সেটি শ্রীমান রণজয়েরই।

— তাই নাকি?

— শুধু তাই নয়, আরও অনেক কেলো বেরিয়েছে। মিস্টার অ্যাপোলো একটি আস্ত ক্যাসানোভা। বিয়ের আগে থেকেই নাকি শাশুড়ির সঙ্গে তার আশনাই ছিল। মেয়েকে বিয়ে করেও মোহব্বতে ছেদ পড়েনি। একই সঙ্গে দু'দিকে ডিউটি করে যাচ্ছিল। এভরি ফ্রাইডে নাকি জোর রংরলিয়া চলত শাশুড়ি জামাইয়ে। সারা দুপুর। তবে কথায় আছে না, জন জামাই ভাগ্না কেউ নয় আপনা...! পার্থ হ্যা হ্যা হাসল, ব্যাটা দিয়েছে শাশুড়িকে মোক্ষম দাওয়াই।

মিতিনের একটুও হাসি পেল না। গোমড়া মুখে বলল, তা শাশুড়ি-জামাইয়ের রিলেশনের গল্পটা কী ভাবে পিকচারে এল?

— কাজের মেয়েটা বলেছে। রণজয়ও কনফেস করেছে।

— খুনটাও?

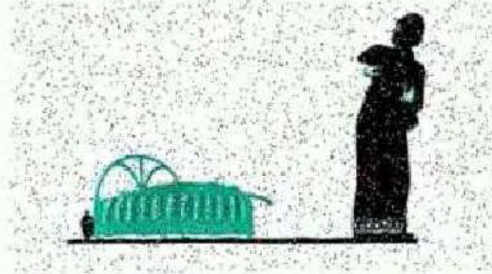
— সেটা অবশ্য টিভিতে বলল না। তবে স্বীকার তো করতেই হবে। পুলিশের গুঁতো যখন পড়বে পিঠে...।

— বাপ-মেয়ের কী রিঅ্যাকশন? তাদের দেখাল খবরে?

— মুহ্যমান মুখে বসে আছে দু'জন। স্পিকটি নট। ...ফ্যামিলিতে এমন একখানা রগরগে স্ক্যান্ডাল, ঠোঁটে আর বাক্যি ফোটে!

পার্থকে বেশ পুলকিত দেখাচ্ছে। ধীর পায়ে ঘরে এল মিতিন। সালোয়ার কুর্তা বদলে নাইটি চড়িয়ে নিল গায়ে। তার পর বাথরুম টাথরুম ঘুরে ফের এসেছে সোফায়। আরতি চা রেখে গেল, চুমুক দিচ্ছে কাপে, নিশ্চুপ মুখে।

পার্থ টেরিয়ে টেরিয়ে মিতিনকে দেখছিল। নাক কুঁচকে বলল, টিকটিকি ম্যাডাম হঠাৎ গুম? আপসেট? মিতিনের ঠোঁট নড়ল, একটু।



— রণজয় অ্যারেস্ট হল বলে? পার্থ খিকখিক হাসছে, না কি তোমার আগে পুলিশ কেসটা সল্‌ভ করে ফেলল, সেই শোকে?

— দুটোর কোনওটাই না। আমার ধারণা, কোথাও একটা গণ্ডগোল হচ্ছে।

— হাসিও না তো। হুইস্কিতে আর্সেনিক, গ্লাসে হাতের ছাপ, চারটে অব্দি লাবণ্যর ফ্ল্যাটে র ণজয়ের প্রেজেন্স, তাদের অবৈধ সম্পর্ক... আর কী চাই?

— কিন্তু মোটিভ?

— লাবণ্য নিশ্চয়ই আশনাইটা আর টানতে চাইছিল না। জামাই তাই রাগে...

— টেঁকে না। লাবণ্যর প্রেমে গদগদ থাকলে রণজয় মোটেই রুমকিকে বিয়ে করত না। হি হ্যাড লং টার্ম ইন্টেনশন। শ্বশুরের সম্পত্তি।

— সে দিক দিয়েও ভাবা যায়। রণজয়ই হয়তো নোংরা রিলেশনটা থেকে ছাড়ান পেতে চাইছিল, আধবুড়িটা রাজি হচ্ছিল না। হয়তো সে ভয় দেখিয়েছিল, মেয়ের কাছে রণজয়ের আসলি চেহারা ফাঁস করে দেবে। ওই খ্যাপা মহিলার পক্ষে যা আদৌ অসম্ভব নয়। আর জানাজানি হওয়া মানেই তো সর্বনাশ। এমারেল্ড টাওয়ারের দু'খানা ফ্ল্যাট থেকে শুরু করে যাবতীয় অ্যাসেট মরীচিকার মতো ভ্যানিশ। অগত্যা মরিয়া হয়ে এই কুকীর্তি।

— এটা তাও মন্দ শোনাচ্ছে না। স্লো-পয়জনিংয়ের কমপ্লেনটাও এর সঙ্গে অনেকটা মেলানো যায়। মিতিন ঘাড় নাড়ল, তবু... এমন একটা বোকামি... আর্সেনিক মেশানো হুইস্কিটা ওভাবে ফেলে রেখে গেল? গ্লাস ধুয়ে জায়গা মতন রেখে দিলে তো সুইসাইড ছাড়া কিছু ভাবাই যেত না।

— এই সিলি ভুলগুলো করে বলেই না ক্রিমিনালরা ধরা পড়ে। পার্থ গলা ফাটিয়ে হাসল, আর তোমরা টিকটিকিরা তাদের ঘেঁটি পাকড়ে করেকম্মে খাও।

— যা খুশি বলতে পারো, আমি কিন্তু কনভিন্সড নই। মিতিন টেবিলে কাপ নামাল, এখনও বেশ কয়েকটা ফাঁক আছে। দু'একটা কো ইন্সিডেন্সও ভারী অদ্ভুত।

— যেমন? পার্থ ভুরু কুঁচকোল, তুমি কি এখনও লাবণ্য দেবীর হাজব্যান্ডকেই ধরে বসে আছ?

— আমি কাউকেই ধরে নেই। আবার কাউকে ছাড়ছিও না।

— বুঝেছি। পার্থ চা শেষ করে সিগারেট ধরিয়েছে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, এমন অবশ্য হতেই পারে লোকটা জামাইকে ফাঁসিয়ে নিজে পাঁকাল মাছের মতো পিছলে গেল। অনিমেষবাবু যেন কখন আবার এসেছিল এমারেল্ড টাওয়ারে?

— অ্যাকর্ডিং টু হিজ স্টেটমেন্ট, অ্যারাউন্ড পৌনে চারটে। দশ বিশ মিনিট এ দিক ও দিকও হতে পারে। সিকিয়োরিটির লোক ঠিক টাইম বলতে পারছে না।

— তা হলে সন্দেহ তো থাকেই। অফিস গিয়েও সে আবার ফিরেছিল কেন? বলেছে খুব টায়ার্ড

ছিল, অথচ নিজের ফ্ল্যাটে না ঢুকে গাড়ি রেখে পার্কে গিয়ে বসে রইল?

— গ্লাসে কিন্তু তার হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি।

— রাইট। এইখানেই তো কেসটা গুলিয়ে যাচ্ছে।



— কেন মিছিমিছি মগজকে ট্যাক্স করছ? ছাড়ো না। বলেই মিতিন ঠোঁট কামড়ে দু'এক সেকেন্ড ভাবল কী যেন, তার পর মোবাইলে চেনা নম্বর টিপছে।

— আরে, ম্যাডাম যে? ও প্রান্তে সুবীরের স্বরে উল্লাস, দেখেছেন তো নিউজ, চিড়িয়াকে খাঁচায় পুরেছি।

মিতিন গলা মোলায়েম করে বলল, কাজটা ঠিক হল কি? পরে পস্তাতে হবে না তো?

— কেন, কেন, কেন?

— কী বিষে লাবণ্যদেবীর মৃত্যু হয়েছে তা কিন্তু এখনও আননোন। আর্সেনিকে মুখ দিয়ে ও-রক ম গ্যাঁজলা বেরোয় না।

— রাখুন তো আপনার থিয়োরি। হুইস্কির সঙ্গে পাঞ্চ করে পেটে কী রিঅ্যাকশন করেছে তার কি কোনও ঠিক আছে?

— তবু... ভিসেরা রিপোর্ট অব্দি ওয়েট করলে হত না?

— আহা, চার্জশিট তো তার পরেই ফ্রেম করব। নিশ্চিন্ত থাকুন, ভিসেরা আমাকে ডোবাবে না।

ডুবতে কিন্তু হলই সুবীর হালদারকে। পুরোটা না হলেও, অনেকটাই। পুজোয় কুলু মানালি বেড়াতে গিয়েছিল মিতিনরা, ফিরল দেওয়ালির মুখে মুখে। হপ্তাখানেক পরেই এক সন্ধেবেলা সুবীরের ফোন, ম্যাডাম কি বাড়িতে আছেন?

— আছি। কেন?

— আমি আসছি। জরুরি দরকার।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই বাড়ির সামনে পুলিশের জিপ। হন্তদন্ত পায়ে সুবীরের প্রবেশ। ধপাস করে সোফায় বসে বলল, আপনার প্রেডিকশনই ফলে গেল।

মিতিন মুচকি হাসল, লাবণ্য মজুমদারের ভিসেরা রিপোর্ট এসেছে বুঝি?

— আজই পেলাম। মহিলার লিভার কিডনিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে বটে, তবে তা নিতান্ত সা মান্য। লিথাল ডোজ একেবারেই নয়।

— তা হলে পয়জনিংটা...?

— দু'ধরনের ওযুধের জয়েন্ট এফেক্ট। স্ট্রেঞ্জ কেস ম্যাডাম।

— ওষুধ? কী ওষুধ?

— নামগুলো হল...। বুকপকেট থেকে একখানা চিরকুট বার করল সুবীর। চোখ থেকে বেশ খানিক দূরে ধরে বিনা চশমায় পড়ছে, মনো অ্যামিনো অক্সিবেসড ইনহিবিটরস। আর অ্যামিট্রি পটিলিন...



— এগুলো তো মেন্টাল ডিপ্রেশনের মেডিসিন! রিভার্স গ্রুপ! হাইলি রিঅ্যাক্টিভ! দুটো একসঙ্গে পড়লে ঘণ্টাখানেক, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে যে কেউ মারা যাবে।
— তাই বুঝি? সুবীর মাথা চুলকোচ্ছে, তা হলে তো এটা সুইসাইডের কেসও হতে পারে। কিংবা মহিলা ভুল করে একসঙ্গে দুটো মেডিসিন...
— কিন্তু দুটো একসঙ্গে থাকবে কেন?
— কারেক্ট। সুবীর খাড়া হয়ে বসল, এই লাইনেও তো রণজয় চৌধুরীকে বাঁধা যেতে পারে। ব্যাটা নির্ঘাত আর্সেনিক মেশানো মদ গেলাতে না পেরে বাই ফোর্স ওই দুটো ওষুধ খাইয়ে...
— কেস গুছিয়ে সাজাতে পারবেন তো?
— খুব পারব। ওই ধিনিকেষ্টকে আমি ছাড়বই না। ভালমানুষ বাবা আর নিরীহ মেয়েটাকে যে কত যন্ত্রণা দিয়েছে... সাজা বাছাধনকে পেতেই হবে।
— রণজয় কি এখনও জেল কাস্টডিতে?
— বেরনোর জন্য হাঁকপাঁক করছে। ওর বাপ দাদারা হাইকোর্ট অব্দি বেল পিটিশন মুভ করেছিল, খারিজ হয়ে গেছে।
— রণজয়কে জেরা করে কিছু বের করা গেল?
— রিলেশনটা অ্যাডমিট করছে, কিন্তু মার্ডার চার্জটা মানছে না। এনিওয়ে, তুলি তো কোর্টে, তার পর দেখা যাবে।

ঢকঢক দু'গ্লাস জল খেয়ে চলে গেল সুবীর। মিতিন গিয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যালকনিতে। মিনিট দশেক পর ফিরল ঘরে। পায়চারি করছে আপন মনে। হঠাৎই কী ভেবে নিজের স্টাডিরুমে এসে কাগজ কলম নিয়ে বসল। লিখছে, আঁকিবুঁকি কাটছে...। মোবাইল তুলে আচমকা ডায়াল করল অনিমেষ মজুমদারকে। জেনে নিল ডক্টর সেনের নাম্বার। ফের মোবাইলের বোতামে আঙুল। হ্যাঁ, পেল লাবণ্যর ডাক্তারকে। কথা সেরে অফ করে দিল ফোন। মাথা রাখল টেবিলে। ঘাড় গুঁজে বসে আছে মিতিন। বসেই আছে।

বাসস্টপ থেকে রুমকিকে দেখতে পেল মিতিন। স্কুলগেট পেরিয়ে এগিয়ে আসছে মন্থর পায়ে। জীবন্ত এক বিষাদপ্রতিমা যেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কলকল করছে চার পাশে, কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই রুমকির। এমনই উদাস, এমনই সন্তপ্ত।

কাছে গিয়ে মিতিন মৃদু স্বরে ডাকল, রুমকি?
চমকেছে মেয়েটা। অবাক মুখে বলল, আপনি? এখানে?
— আপনার কাছেই এসেছি। স্কুল ছুটির জন্য অপেক্ষা করছিলাম।
— দরকার আছে কোনও?
— হুঁ। ...এমারেল্ড টাওয়ার তো কাছেই, চলুন না এগোতে এগোতে কথা বলি।



পড়ন্ত বেলা। হেমন্তের পেলব রোদ্দুর মায়া বিছিয়েছে পথে। টুপটাপ ঝরছে শুকনো পাতা। বাতাসে হাল্কা শিরশিরে ভাব। হাঁটতে হাঁটতে মিতিন নিচু গলায় বলল, আপনাকে একটা গল্প শোনাব। এক দুঃখী মেয়ের কাহিনি।

রুমকি ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল— হঠাৎ?

— এমনিই। ইচ্ছে করছে। গল্পটা বোধহয় আপনার চেনা চেনা লাগবে। বুনতে গিয়ে যদি কোথাও ফাঁকফোকর আসে, আপনি শুধরেও দিতে পারেন। আড়চোখে রুমকিকে দেখে নিয়ে মিতিন শুরু করল, নেহাতই মধ্যবিত্ত এক তরুণীর বিয়ে হয়েছিল এক ব্রাইট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। স্রেফ রূপের জোরে। বিয়ের বছর দেড় দুই পর তাদের একটি মেয়ে হল। তার পর থেকেই মহিলা যেন কেমন বদলে যেতে থাকল। তার বর সাফল্যের পেছনে হন্যে হয়ে ছুটছে, রোজগার করছে এন্তার, বউকে স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের উপকরণ কিনে দিচ্ছে রাশি রাশি, কিন্তু বউয়ের জন্য খরচ করার সময় তার নেই।

স্বামীর সাহচর্য না পেয়ে পেয়ে, এক চোরা বুভুক্ষা থেকে, মহিলার মধ্যে জন্ম নিল এক অদ্ভুত বিকৃতি। স্বাভাবিক ঘরোয়া জীবন আর তার পছন্দ নয়, তার চাই নিত্যনতুন উত্তেজনা। চাই নেশা, চাই উদ্দামতা। ক্লাব। পার্টি। পুরুষমানুষ। একটু একটু করে সে চলে গেল স্বামীর হাতের বাইরে। নিজের মেয়ের দিকেও সে ফিরে তাকায়নি। মা নয়, সেই মেয়েটাকে নিয়েই আমার গল্প।

— কী গল্প?

— বলছি তো। ...মেয়েটা আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে। তার এক দিকে কাজপাগল বাবা, অন্য দিকে তুমুল উচ্ছৃঙ্খল মা। দু'জনের মাঝখানে পড়ে সে একা, ভীষণ একা। শামুকের মতো খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রাখে সে, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও মিশতে পারে না। কলেজ টলেজ পাশ করে মেয়েটা মোটামুটি একটা চাকরি জুটিয়ে ফেলে ডুবে থাকতে চাইল অন্য দুনিয়ায়। এমনই এক সময়ে মেয়েটির জীবনে এল এক অনিন্দ্যকান্তি পুরুষ। তার মা ই পরিচয় করিয়ে দিল ছেলেটার সঙ্গে। নেহাতই সাদামাটা চেহারার অন্তর্মুখী মেয়েটা স্বপ্নেও ভাবেনি এমন একটি রূপবান পুরুষ আসবে তার জীবনে।

ছেলেটা তার প্রতি সামান্য আগ্রহ দেখাতেই সে পাগলের মতো ভালবেসে ফেলল তাকে, আর বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে তো আত্মহারা। বেচারা তখন ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, গোটা ঘটনাটাই একটা সাজানো ছক। তার মা চেয়েছিল মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ছেলেটাকে পুরোপুরি কব্জায় রাখতে। আর ছেলেটার টার্গেট ছিল সো কল্ড শ্বশুরের সম্পত্তি।



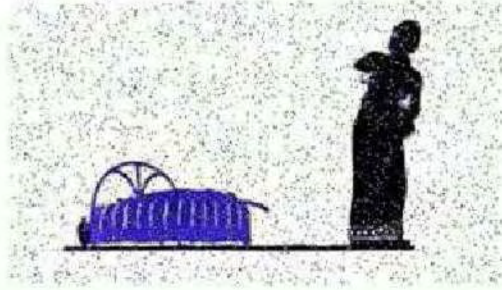
যাই হোক, বিয়ের পর দিব্যি চলছিল শাশুড়ি জামাইয়ের লীলাখেলা। তবে বাইরে বাইরে। নতুন একটি মেয়ে কাজে লাগার পর বাড়িতেই শুরু হয়ে গেল ফুর্তি। কাজের মেয়েটা সপ্তাহে এক দিন

দুপুরে বেরিয়ে যায়, ঠিক সেই সময়টায়। কিন্তু কপাল খারাপ। কাজের মেয়েটা এক দিন কী কারণে যেন বেরিয়েও ফিরে এল, গোপনে দেখে ফেলল সমস্ত কীর্তিকলাপ। ব্যস, খবর পৌঁছে গেল মেয়ের কানে। অমনি আগুন জ্বলে উঠল তার বুকে। প্রতিহিংসার। ঘেন্না তো মাকে সে করতই, এ বার স্থির করল একেবারে শেষ করে দেবে। শুরু হল পরিকল্পনা মাফিক আর্সেনিক পয়জনিং। কেমিস্ট্রির ছাত্রী সে, জানে চায়ের সঙ্গে কতটুকু করে মেশালে মা ধিকিধিকি মরবে, কিন্তু কাকপক্ষীটিও টের পাবে না।

তা সে মতোই চলছিল। তবে বিধি বাম। আচমকা এক বই পড়ে মার মনে ধন্দ জাগল। সেঁকো বিষের লক্ষণ কেন ফুটে উঠছে দেহে? মানসিক রোগী বলে ডাক্তারও যখন তাকে তেমন আমল দিল না, সে ছুটল ডিটেকটিভের কাছে। ডিটেকটিভ মাকে রক্ত পরীক্ষা করাতে বলেছে জেনেই মেয়ে প্রমাদ গুনল। সর্বনাশ, এ বার তো চক্রান্ত ধরা পড়ে যাবে!

আর সময় নষ্ট করল না মেয়ে। প্ল্যান মাফিক শুক্রবার স্কুল যাওয়ার আগে মার কাছ থেকে প্যাথোলজিকাল ল্যাবরেটরির রসিদটা চেয়ে নিল, রিপোর্টটা সে নিজেই আনবে। দুপুরে জানল, বাবা হঠাৎ ফিরে এসেছে। বাবার অবর্তমানেই কাজটা শেষ করার ইচ্ছে ছিল তার, কিন্তু তখন আর পিছনোর উপায় নেই। স্লো পয়জনিংয়ের ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে যে। অতএব পুরনো পরিকল্পনা মতোই চারটে বাজার মিনিট কয়েক আগে ফোন করল নিজের ফ্ল্যাটে, বর তখন আট তলায়, ধরল না।

সঙ্গে সঙ্গে বরকে মোবাইলে ফোন। বলল, লোক আসবে, তাকে বসাও। বর তড়িঘড়ি নেমে এল নীচে। ফ্ল্যাটে সে ফিরল কিনা বুঝে নিতে ফের নীচের ল্যান্ডলাইনে ফোন। হ্যাঁ, কাঁটা সরে গেছে, ময়দান ফাঁকা। এ বার মেয়ে সোজা গেল মায়ের ফ্ল্যাটে। জামাইয়ের সঙ্গে ব্যভিচার নিয়ে সরাসরি মাকে চার্জ করল। অমনি হিস্টিরিক হয়ে পড়ল মা। তাকে শান্ত করার জন্য মেয়ে পলকে নরম, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দুটো ওষুধ খেতে দিল।



মার সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সুবাদে সে জানত মানসিক অবসাদের ওই দুটো ওষুধ একসঙ্গে খেলে এক দেড় ঘণ্টার মধ্যে মা মরবেই। তবু অপেক্ষা করল খানিক ক্ষণ। যত ক্ষণ না মার কনভালশন থামে। তার পর ঠাণ্ডা মাথায় সিংকে নামানো দুটো গ্লাসের একটাকে রুমালে জড়িয়ে তুলে এনে, তাতে ফের হুইস্কি ঢেলে, দুশো মিলিগ্রামের বেশি আর্সেনিক মিশিয়ে রাখল সকলের দৃষ্টির সামনে। নিঃশব্দে নিজের ফ্ল্যাটে এসে ইনশিওরেন্সের এজেন্টের সঙ্গে কথা বলল, চাউমিন বানাল...।

সে অবশ্য জানতে পারেনি, তার বাবাও সে দিন ফিরেছিল ফ্ল্যাটে। খানিক আগেই। বউ আর জামাইকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ছিটকে বেরিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। এখন অবশ্য বাবা মেয়ে দু'জনেরই হাড় জুড়িয়েছে। মহিলাও খতম, জামাইও শ্রীঘরে। একটানা বলে থামল মিতিন। দেখছে রুমকির প্রতিক্রিয়া। অনেক ক্ষণ পর রুমকির স্বর ফুটল, মেয়েটার এখন কী করা উচিত?

— সেটা মেয়েটাই ঠিক করুক। রুমকির কাঁধে হাত রাখল মিতিন। আলতো হেসে বলল, তবে এটুকু বলতে পারি, নিজে সারেন্ডার না করলে মেয়েটাকে কোনও দিনই ধরা যাবে না।

নিঝুম হয়ে শুনল রুমকি। নিঃশব্দে অতিক্রম করল বাকি পথটুকু। এমারেল্ড টাওয়ারের গেটে পৌঁছে নির্জীব চোখে এক বার দেখল মিতিনকে। তার পর চলে গেল পায়ে পায়ে। পর দিন সকালে সুবীর হালদারের ফোন পেল মিতিন। এমারেল্ড টাওয়ারে আবার অস্বাভাবিক মৃত্যু। এ বার আট তলা নয়, তিন তলায়। ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে রুমকি।